জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১১, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১

যুগান্তর-এর রাজনৈতিক কার্টুনে মুক্তিযুদ্ধের উপস্থাপন

শহীদ কাদের চৌধুরী* ও সহুল আহমদ**

Abstract

During the liberation war of 1971, the political cartoons of the daily *Jugantar* of West Bengal became a wall of protest. The humor and political spirit of Rebati Bhushan, Amal Chakraborty, and Sufi (Naren Roy) depicts another kind of protest in the pages of *Jugantar*. This article analyzes the nature and characteristics of more than a hundred cartoons published in 1971. The background of the war, the course of events, the refugee crisis and global politics centering liberation war- all came up in the aggressive or humorous caricatures. In these cartoons, just as there is a supportive position on the question of liberation war, there is also a dominant Indian narrative in the presentation of the cartoons.

ভূমিকা

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং জাতি-রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আবির্ভাব দক্ষিণ এশিয়া তথা আধুনিক রাষ্ট্রের ইতিহাসে এক বড় ঘটনা। ১৯৪৭ সালে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার মাত্র পঁচিশ বছরের মধ্যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ঔপনিবেশিক ও কর্তৃত্ববাদী কাঠামো[১] থেকে বের হয়ে একাত্তর সালে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন জাতি-রাষ্ট্র হিসেবে পথচলা শুরু করে। পুরো পাকিস্তান আমল জুড়েই পাকিস্তান রাষ্ট্রের দুই অংশের ক্রমাগত বৈষম্য এবং জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে এই ভূখণ্ডের জনগণ নানামুখী গণতান্ত্রিক ধারার আন্দোলন সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছিল। সেই আন্দোলন-সংগ্রাম চূড়ান্ত রূপ লাভ করে ১৯৭১ সালে। এই সময়ে দেশের বাইরে ও ভেতরে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ব্যাপক জনমত গড়ে ওঠে। ইতোমধ্যে স্বীকৃত যে, জনমত গঠনে পৃথিবীর নানা প্রান্তের লেখক, শিল্পী, রাজনীতিবিদ, কবি, সাহিত্যিক, কার্টুনিস্টরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।[২] একইভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে অজস্র কার্টুন আঁকা হয়েছিল। সে কার্টুনগুলো নিয়ে বিভিন্ন ধরনের সংকলন প্রকাশিত হলেও মুক্তিযুদ্ধকালীন কার্টুন নিয়ে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা অনুপস্থিত। যদিও একাত্তরের কার্টুন নিয়ে ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে।[৩] মুক্তিযুদ্ধের সাথে সক্রিয় সম্পৃক্ততা ও বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণেই ভারতের পত্রিকাগুলোতে সর্বাধিক কার্টুন আঁকা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে, একাত্তর সালে ভারতীয় পত্রিকা *যুগান্তর*-এ প্রকাশিত কার্টুনে মুক্তিযুদ্ধ কীভাবে হাজির হয়েছে এবং মুক্তিযুদ্ধের কোন বয়ানকে সামনে নিয়ে এসেছে সেটা বিশ্লেষণ করা। প্রবন্ধে দেখানো হবে যে, কার্টুনগুলোতে বিভিন্ন মিশ্র বিষয় ফুটে উঠেছে। তবে এর একটি প্রধান বয়ান রয়েছে যা মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক ভারতীয় প্রভাবশালী বয়ানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কার্টুনগুলোকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

---

*সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
** গবেষণা কর্মকর্তা, গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা

তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত

ব্যঙ্গচিত্র বা কার্টুন ও ক্যারিকেচার অঙ্কনশিল্পের একটি শক্তিশালী মাধ্যম; বর্তমানে মতামত প্রকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমও বটে। ক্যারিকেচার ও কার্টুনের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। ক্যারিকেচার যেখানে সাধারণত কোনো একজন ব্যক্তির চেহারাকে অতিরঞ্জিত করে হাজির করে, সেখানে কার্টুনকে মনে করা হয় সমালোচনা বা সামাজিক প্রতিবাদ প্রকাশের একটা মাধ্যম হিসেবে।[৪] ডার্ক কোজে (Dirk Kotzé) কার্টুনকে রাজনৈতিক যোগাযোগের একটি মাধ্যম হিসেবে বর্ণনা করেন।[৫] যে কার্টুনগুলো বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আঁকা হয়ে থাকে এবং একটি রাজনৈতিক ভাষ্য প্রদানে সচেষ্ট হয় সেগুলোকে রাজনৈতিক কার্টুন বলা হয়ে থাকে। রাজনৈতিক কার্টুনকে 'শিক্ষক ও সম্পাদক, বিক্রেতা ও প্রলোভনকারী'[৬] এবং রাজনৈতিক ডিসকোর্সের একটি ঘরানা[৭] হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়ে থাকে। আধুনিক জমানায় কার্টুনের প্রধান ও প্রাথমিক কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজনৈতিক ভাষ্য এবং সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় মতামত প্রচার এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক কমেডি উপস্থাপন। বর্তমানে রাজনৈতিক কার্টুন যে সকল বিষয়বস্তুর দিকে আলোকপাত করে সেগুলোর একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দিয়েছেন নাটালিয়া। বিষয়গুলো হচ্ছে: ব্যক্তি হিসেবে রাজনৈতিক নেতা, রাজনৈতিক নেতা ও তার রাজনীতি, অর্থনৈতিক সংস্কার, নির্বাচনকেন্দ্রিক লড়াই, সামরিক যুদ্ধ, ছায়া রাজনীতি, দেশের মর্যাদা, রাষ্ট্রের ঘরোয়া নীতি।[৮]

রাজনৈতিক কার্টুন বিদ্রূপাত্মকভাবে বা হাস্যরসাত্মকভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয় বা ঘটনা হাজির করলেও এই বিদ্রূপ বা হাস্যরস আবশ্যক নয়। ম্যাথু ডায়মন্ড বলছেন যে, রাজনৈতিক কার্টুন একইভাবে অ-বিদ্রূপাত্মক ও হাস্যরসহীন হতে পারে।[৯] কার্টুন যেমন গুরুতর রাজনৈতিক বিতর্ক ও উত্তেজনাকে প্রশমিত করে দিতে পারে এবং একটা পর্যায় পর্যন্ত বিতর্ককে শান্তিপূর্ণ উপায়ে এগিয়ে নিতে সাহায্য করতে পারে[১০], আবার উল্টো দিকে কার্টুন 'হেট স্পিচ'ও ছড়াতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানে নাজিদের পত্রিকা, ট্যাবলয়েড, ম্যাগাজিন নিয়মিত ইহুদি-বিদ্বেষী কার্টুন প্রকাশ ও প্রচার করতো।

তবে একেবারে সাম্প্রতিক সময়ে রাজনৈতিক কার্টুনকে ঘিরে যে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছে তা বোধহয় ইতিহাসের আর কখনওই ঘটেনি। একদিকে রাষ্ট্রগুলো, তা গণতন্ত্রী হোক বা স্বৈরতন্ত্রী হোক বা ফ্যাসিবাদী হোক, মতের বিরোধী কার্টুনিস্টদের উপর দমন পীড়ন করছে। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশ[১১] ও আমেরিকার কথা বলা যায়। ক্রিস ল্যাম্ব আমেরিকার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে কার্টুনিস্টদের ওপর বুশ প্রশাসনের দমনমূলক নীতির কথা বলেছেন।[১২] অন্যদিকে, ২০০৫ সালে ডেনমার্কের একটি পত্রিকা ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নবি হযরত মোহাম্মদের কার্টুন ছাপানোতে প্রচণ্ড বিতর্কের সৃষ্টি হয়। মুসলমান দুনিয়া প্রচণ্ড ক্ষোভে ফেটে পড়ে। ২০১৫ সালে ফরাসি পত্রিকা শার্লি হেব্দো একইরকম ধর্মীয় বিতর্কের বেড়াজালে পড়ে। নবি হযরত মোহাম্মদের কার্টুন ছাপানোর প্রতিক্রিয়ায় ইসলামপন্থী সন্ত্রাসীদের আক্রমণে ১৭ জন প্রাণ হারান। সারা দুনিয়াতে এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার প্রতিবাদ জানানো হয়, আক্রান্ত কার্টুনিস্টদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করা হয়। একইসাথে আবার রাজনৈতিক কার্টুনকে কেন্দ্র করে বাক-স্বাধীনতার সীমানা নিয়েও প্রাচ্যে ও পশ্চিমে জোরেশোরে আলাপ শুরু হয়। কেউ কেউ বাক-স্বাধীনতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখেছেন, আবার কেউ কেউ এতে আক্রমণাত্মক বিদ্রূপ দেখেছেন।[১৩] এই পরিপ্রেক্ষিতে কেউ কেউ কার্টুনিস্টদের প্রতি সমাজের দায় এবং সমাজের প্রতি কার্টুনিস্টদের দায় কী হবে তা নিয়ে আলোচনা করতে সচেষ্ট হয়েছেন।[১৪]

বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশে কার্টুনের প্রচলন আসলে সংবাদমাধ্যম শুরু হওয়ার সাথে জড়িত; ফলে ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়ার সাথেও জড়িত, এবং আরও বহু জিনিসের মতন ঔপনিবেশিক শাসকদের কল্যাণে আমদানিকৃত। কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্র উপনিবেশ স্থাপনকারীদের হাত ধরে প্রবেশ করলেও বাংলার সমাজজীবনে রঙ্গব্যঙ্গ বা রসাত্মকভাবে উপস্থাপনের বিভিন্ন মাধ্যমের কমতি ছিল না। এছাড়াও বাংলা লিখিত গদ্যে ব্যঙ্গ-কৌতুক এবং সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতি তুলে ধরার প্রচলন ছিল। *নববাবু বিলাস*, *হুতোম প্যাঁচার নকশা* এই ঘরানার সৃষ্টি। এর ধারাবাহিকতায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতাকেন্দ্রিক ক্যারিকেচার ব্যাপারটা চালু হয়। ভারত উপমহাদেশে প্রথম মুদ্রিত কার্টুন *Delhi Sketch Book*, সেটা ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের আগের ঘটনা। এরপর ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয় *Indian Punch, Indian Charivari* ইত্যাদি। কার্টুনের জন্য প্রসিদ্ধ দৈনিক *অমৃতবাজার পত্রিকা* প্রথম কার্টুন ছাপায় ১৮৭২ সালে।[১৫] বাংলা ভাষার প্রথম কার্টুন পত্রিকা *'হরবোলা ভাঁড়'* প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ সালে।[১৬] এই অঞ্চলে কার্টুন চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ *'বসন্তক'* বাংলা ভাষার দ্বিতীয় কার্টুন পত্রিকা।[১৭] ইংরেজি কমিক ম্যাগাজিন *Punch*- এর আদলেই এখানকার ম্যাগাজিনগুলো কার্টুন ছাপানো শুরু করে, তা সে-ম্যাগাজিন ইংরেজ মালিকানা বা ভারতীয় মালিকানা যাই হোক না কেন। ব্রিটিশ মালিকানাধীন কমিক ম্যাগাজিনগুলো খোদ লন্ডনের মতো করে বয়ান বা রূপ তৈরি করত। লন্ডনে প্রকাশিত কার্টুনগুলোতে চিরাচরিত ঔপনিবেশিক উপস্থাপনাই থাকত। যেমন, এখানে উপনিবেশের মিশন হচ্ছে 'সভ্যতা বানানোর মিশন,' বা 'হোয়াইট ম্যান বার্ডেন'। গবেষকরা বলেন যে, ঔপনিবেশিক আমলে প্রকাশিত কার্টুনগুলো যতটা না রাজনৈতিক কার্টুন তার চেয়ে বেশি সামাজিক কার্টুন।[১৮] তবে গগনেন্দ্রনাথের কার্টুনে বিশ শতকের প্রথম তিন দশকের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের অসঙ্গতিগুলো দুর্দান্তভাবে ফুটে উঠেছিল। দেশভাগের পর ঢাকাকেন্দ্রিক শিল্পচর্চা শুরু হলেও বাংলাদেশের কার্টুনিস্টরা ধীরে ধীরে নিজেদের মেলে ধরতে থাকেন। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ষাটের দশকে যখন স্বাধিকার আন্দোলন এবং পরবর্তীকালে স্বাধীনতা আন্দোলন তুঙ্গে উঠছে, তখন কার্টুনিস্টরাও সক্রিয়ভাবে তাতে অংশগ্রহণ করেন।

স্ট্রেচারের মতে, রাজনৈতিক কার্টুন পাঠ করার জন্য কার্টুনে উপস্থাপিত বিষয়, কার্টুনিস্ট, এর দর্শক ও পাঠক, এবং যে সামাজিক ও ঐতিহাসিক ঘটনার ভেতর এই কার্টুন আঁকা হয়েছে সেটা সম্পর্কে সম্যক বোঝাপড়া প্রয়োজন। কার্টুনের ভাষা বোঝার জন্য কখনও কখনও কার্টুনিস্ট প্রদত্ত বাক্য, সংবাদ ইত্যাদি সহায়ক।[১৯] এর বিপরীতে কোপ আরও কিছু কার্টুনের উদাহরণ দিয়ে যুক্তি দেন যে, সকল কার্টুনের জন্য কার্টুনিস্ট প্রদত্ত তথ্যের প্রয়োজন পড়ে না, কার্টুন নিজেই নিজের কথা বলতে পারে।[২০] কার্টুনকে বিচার-বিশ্লেষণ করার জন্য উমবার্তো ইকোর বরাত দিয়ে ম্যাথু ডায়মন্ড তিনটা পদ্ধতির কথা বলেছেন; এক) লেখক [কার্টুনিস্ট] কেন্দ্রিক; দুই) পাঠক [কার্টুনের দর্শক] কেন্দ্রিক; তিন) পাঠ [কার্টুন] কেন্দ্রিক।[২১] প্রথমটির জন্য প্রয়োজন কার্টুনিস্টের মনস্তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত; দ্বিতীয়টির জন্য প্রয়োজন কার্টুনের দর্শকদের সামাজিক ও মতামতের বিচার; তৃতীয়টির জন্য প্রয়োজন খোদ কার্টুনের ভাষা। এই প্রবন্ধে তৃতীয় পদ্ধতিটিই ব্যবহার করা হবে। ইতিহাসের একটা বিশেষ সময়ে কার্টুন আসলে কোন বয়ান হাজির করে আমাদের সামনে সেটা দেখা হবে।

'যুগান্তর'

অধুনালুপ্ত *যুগান্তর* পত্রিকা ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক। মুক্তিযুদ্ধকালে *যুগান্তর* একেবারে শুরু থেকেই মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নে বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে; প্রতিনিয়ত মুক্তিযুদ্ধের সংবাদই প্রধান শিরোনাম হতো। অবশ্য বাংলাদেশের বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রাম বা ঘটনায় *যুগান্তর*-এর সক্রিয়তা এটাই প্রথম নয়। পাকিস্তান আমলের আর অনেকগুলো ঘটনায় পূর্ব বাংলার দাবি-দাওয়ার পক্ষেই অবস্থা নিত। *যুগান্তর*ও পূর্ব বাংলার মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিল। ১৯৫৪ সালে পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন নিয়ে *যুগান্তর-এর* সক্রিয়তা প্রসঙ্গে মোহাম্মদ বশির মন্তব্য করেন, 'বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর প্রতি আগ্রহ ও পূর্ববঙ্গ থেকে অভিবাসিত পশ্চিমবঙ্গের বিপুল সংখ্যক বাঙালির কাছে যাতে পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তা থেকেই সম্ভবত ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার নির্বাচনে *দৈনিক যুগান্তর* পত্রিকা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে।'[২২] আবদুল গাফফার চৌধুরীর মতে, *যুগান্তর*-এর সাথে জড়িত তৎকালীন অনেকের আদি ভিটা বাংলাদেশে [তৎকালীন পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানে] হওয়ার কারণে বোধ হয় এত স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়েছিল। তিনি এক স্মৃতিচারণে লিখেন,

> কলকাতার *যুগান্তর* পত্রিকার সঙ্গে আমার সখ্য গড়ে ওঠে সেই গত শতকের ষাটের ও সত্তরের দশকে। বাংলাদেশে তখন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ছয় দফার আন্দোলনে দেশ উত্তাল। পাকিস্তান সরকার কলকাতার কোনো কাগজ, বইপত্র তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে আসতে দিতেন না। তথাপি যুগান্তর চোরা-গোপ্তা পথে আসত। তাতে ছয় দফা আন্দোলনের পুরো খবর থাকত। থাকত সমর্থনও। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যখন ঐতিহাসিক বিজয় লাভ করে ... যুগান্তর প্রথম পাতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিশাল ছবি ছেপে ব্যানার হেডিং দিয়েছিল, 'পূর্বের আকাশে নতুন সূর্যোদয়।'...বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর কলকাতার প্রতিষ্ঠিত বাংলা ও ইংরেজি দৈনিকগুলো প্রথমে এই যুদ্ধকে সমর্থন দিতে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখায়। যুগান্তর সর্বপ্রথম এই সমর্থন দিতে এগিয়ে আসে। যুগান্তর-এর এই সময়ের বার্তা সম্পাদক (কার্যত নির্বাহী সম্পাদক) ছিলেন দক্ষিণারঞ্জন বসু। তার বাড়ি ছিল বাংলাদেশের বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে। যুগান্তর-এর আরেক সাংবাদিক ছিলেন ঢাকার সাভার এলাকার পরেশ সাহা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে তারা একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন।[২৩]

যুগান্তর বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রশ্নে এতই খোলামেলা অবস্থান গ্রহণ করে যে তাদের প্রকাশিত সংবাদগুলো যতটা বাস্তব তথ্যভিত্তিক হতো তার চেয়ে বেশি হতো যুদ্ধকালীন প্রচারণা বা প্রপাগান্ডার মতো। ঘটনা বা বিবরণীতে অতিরঞ্জন ছিল খুব সাধারণ বিষয়; বোধ হয় যুদ্ধ সম্পর্কে পাঠকদের মনে উদ্দীপনা যোগানো এবং প্রত্যাশা জিইয়ে রাখা ছিল এর অন্যতম কারণ। ১৯৭১ সালের ৩০ মার্চের শিরোনাম, "ঢাকা মুক্তিফৌজের দখলে"[২৪] এবং ৩১ মার্চের শিরোনাম "বাঙলা দেশ প্রায় পুরোই মুক্তিফৌজের কব্জায়"[২৫] অতিরঞ্জন ও যুদ্ধকালীন প্রপাগান্ডার ইঙ্গিত দেয়। পুরো একাত্তর জুড়ে সংবাদের এমন ধরনের পরিবেশনা বজায় ছিল। তবে বিশেষ করে প্রতিরোধ যুদ্ধ সর্বাধিক গুরুত্ব পেতো। *যুগান্তর*-এ প্রকাশিত কার্টুনগুলো বোঝার জন্য এই বিষয়গুলো মাথায় রাখা জরুরি।

ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলের অবসান ঘটেছিল ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করে, ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটো রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে। পাকিস্তানের দুই অংশ, পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম

পাকিস্তানের মধ্যে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা থাকা সত্ত্বেও ধর্মের ওপর ভর করে পাকিস্তান রাষ্ট্র একক রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক ঔপনিবেশিক শোষণ পূর্ব পাকিস্তানে একের পর এক আন্দোলনের জন্ম দিতে থাকে। ভাষা আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনের গতিপথ একসময় একেবারে স্বাধীনতার আন্দোলনের দিকেই ধাবিত হয়। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরাচারী আইয়ুব খানের বিদায়ের পর ক্ষমতায় আসেন ইয়াহিয়া খান। তিনি লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডারের ভিত্তিতে নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দেন। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিশাল জয় অর্জন করলেও পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭১ সালের মার্চের মাসের শুরু থেকে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে শুরু হয় অবিস্মরণীয় অসহযোগ আন্দোলন। ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধু তাঁর বিখ্যাত ভাষণে শাসকদেরকে কিছু শর্ত জুড়ে দেন এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের জন্য ডাক দেন। একই সাথে মার্চের মাঝামাঝিতে শুরু হয় ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর সাথে বঙ্গবন্ধুর বৈঠক। এই বৈঠক চলাকালে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সেনাসদস্য ও অস্ত্রশস্ত্র পূর্ব পাকিস্তানে নিয়ে আসা হয়। মার্চ মাসেই অপারেশন সার্চলাইটের পুরো পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। ২৫ শে মার্চ রাতে গোপনে ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করেন। এরপরই শুরু হয় অপারেশন সার্চলাইট[২৬]। অপারেশন সার্চলাইটের পরিকল্পনার অংশ অনুযায়ী আক্রমণ করা হয় ঢাকা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে, গ্রেফতার করা হয় বঙ্গবন্ধুকে। জেনোসাইডের মুখোমুখি হয়ে প্রায় এক কোটি বাঙালি শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করেন ভারতে। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতারা আশ্রয় নেন ভারতে; এপ্রিলের মাঝামাঝিতে গঠিত হয় প্রবাসী সরকার। ভারতের সহযোগিতায় মুক্তিবাহিনী গঠন, মুজিববাহিনী গঠন ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়; একই সাথে দেশের অভ্যন্তরে অনেকেই অঞ্চলভেদে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে গঠিত যৌথ বাহিনী যুদ্ধ শুরু করে। দুই সপ্তাহের যুদ্ধ শেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী যৌথ বাহিনীর সামনে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ করে। বাংলাদেশ নামক একটি নতুন রাষ্ট্র বিশ্বের বুকে আবির্ভূত হয়।

মুক্তিযুদ্ধ বা ১৯৭১ সালের ঘটনাসমূহকে নিয়ে মোটা দাগে তিনটা প্রধান বয়ান (Grand Narrative) বিদ্যমান: বাংলাদেশের, পাকিস্তানের ও ভারতের। শেনডেল মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক ইতিহাস রচনার দুটো পর্যায় করেন; [২৭] প্রথম পর্যায়ের ইতিহাস রচনায় এই তিনটা বয়ানের আধিপত্য পাওয়া যায়। বাংলাদেশের কাছে একাত্তর হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের বছর, গণহত্যার বেদনা ও স্বাধীনতা অর্জনের বছর। উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদে যে বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে সেটা সেই প্রভাবশালী বয়ানেরই অংশবিশেষ। বিপরীতে পাকিস্তানিদের কাছে একাত্তর 'অঙ্গচ্ছেদ' এর বছর, তারা মনে করেন ভারতের, বিশেষত হিন্দুদের ষড়যন্ত্রে এবং রাজনৈতিক নেতার অদূরদর্শিতার কারণে পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হয়ে গিয়েছে। পাকিস্তানি সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের আত্মজীবনীতে এই বয়ানগুলো খুবই স্পষ্ট।[২৮] ভারত মুক্তিযুদ্ধকে দেখে সাহায্যকারী অবস্থান থেকে: শরণার্থীদের আশ্রয় দান, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ, বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায়ের প্রচেষ্টা এবং পরিশেষে সামরিক হস্তক্ষেপ। তবে কখনও কখনও নিজেদেরকে প্রধান চরিত্র হিসেবে হাজির করার প্রবণতাও লক্ষণীয়। বিশেষত, সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের রাষ্ট্রীয় বয়ানে একাত্তরের যুদ্ধকে কেবল ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ হিসেবেই বিবেচনা করা হয়নি, বরং এই যুদ্ধকে ভারতের অন্যতম বিরাট বিজয় হিসেবে উদযাপন করা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বিজয়ের চল্লিশতম বর্ষ উদযাপনে *হিন্দুস্তান টাইমসের* শিরোনাম ছিল, '1971 War: India's Greatest Triump'।

এমন বেশ কিছু নমুনা আনাম জাকারিয়া তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থে তুলে এনেছেন।[২৯] শেনডেলের মতে[৩০] এই প্রতিটি বয়ানেরই নিজেদের মতো শত্রু-মিত্র পক্ষ রয়েছে। তবে ইতিহাস রচনার দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে এই তিনটা বয়ানেরই বহু সরলীকরণ ভেঙে মুক্তিযুদ্ধের আরও জটিল এক চেহারা হাজির হওয়ার কথা উল্লেখ করেন শেনডেল। বর্তমানে তিন বয়ানকে পাশাপাশি রেখে স্মৃতির রাজনীতি নিয়েও কাজ হচ্ছে। আনাম জাকারিয়ার বইতে এই তিন প্রভাবশালী বয়ানের উপস্থিতি যেমন পাওয়া যায়, তেমনি ব্যক্তির স্মৃতি ও রাষ্ট্রীয় স্মৃতি কীভাবে আলাদা হচ্ছে, আবার আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ছে সেই দিকটাও ফুটে ওঠে। তাঁর মতে, এই তিন দেশের রাজনীতিতে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা ও স্মৃতি 'লয়ালটি কার্ড' হিসেবে ব্যবহৃত হয়।[৩১] তবে এর বাইরেও আরেকটা বয়ান পাওয়া যায় বিশেষত যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের ক্ষেত্রে। যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যমে ১৯৭১ সালকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার যুদ্ধ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পরাশক্তির হিসাব-নিকাশের রণক্ষেত্রে হিসেবে দেখা হয়েছে।[৩২] এছাড়াও মার্কিন সরকার এটাকে সিভিল ওয়ার হিসাবেই অভিহিত করে, বর্তমানে অনেক গবেষকও এটাকে একইভাবে দেখেন।[৩৩] *যুগান্তর* যেহেতু ভারতীয় পত্রিকা, আমরা দেখব পত্রিকাতে মোটা দাগে ভারতীয় বয়ানই হাজির হচ্ছে।

এক নজরে 'যুগান্তর'-এর কার্টুন

এই প্রবন্ধের জন্য *যুগান্তর* পত্রিকার ১৯৭১ সালের মার্চ-ডিসেম্বর সংখ্যাগুলো থেকে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ১০৬টি কার্টুন নেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, এই সময়ে *যুগান্তরে* যত কার্টুন আঁকা হয়েছিল সিংহভাগই ছিল মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে। প্রত্যেক মাসেই কমবেশি কার্টুন আঁকা হয়েছে, তবে সবচেয়ে বেশি আঁকা হয়েছে এপ্রিল (প্রায় ১৮ শতাংশ), মে (১৬ শতাংশ) এবং জুন (১৫ শতাংশ) মাসে। জুলাই (১০ শতাংশ) থেকে কার্টুনের সংখ্যা হ্রাস পেলেও ডিসেম্বরে (১০ শতাংশ) গিয়ে বেড়ে যায়। চারজনের কার্টুন পাওয়া যায়: সুফি (৪৮ শতাংশ), অমল (৪০ শতাংশ), রেবতী ভূষণ (১০ শতাংশ) এবং শৈল চক্রবর্তী (২ শতাংশ)।[৩৪] অর্থাৎ, সিংহভাগ কার্টুন এঁকেছিলেন সুফি ও অমল।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরাই কার্টুনে হাজির থাকত; অর্থাৎ তাদের ক্যারিকেচার ও মুখাবয়ব আঁকা হতো। যেমন, শেখ মুজিবুর রহমান, ইয়াহিয়া খান, ইন্দিরা গান্ধী, জুলফিকার আলী ভুট্টো, নিক্সন-কিসিঞ্জার, চৌ এন লাই-মাও সে তুং, শরণ সিং, জয় প্রকাশ নারায়ণ, পোদগর্নি। কার্টুনের মুখাবয়ব দিয়ে কেবল ব্যক্তিকেই হাজির করা হতো না, ব্যক্তির পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের পলিসি, মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সেই রাষ্ট্রের মনোভঙ্গিও ফুটিয়ে তোলা হতো। যেমন, শেখ মুজিবুর রহমানের ক্যারিকেচার ব্যবহার করে কখনও ব্যক্তি মুজিবকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, আবার কখনও তাঁকে দিয়ে প্রতিবাদমুখর বাংলাদেশের জনগণকে তুলে ধরা হয়েছে। ইন্দিরা গান্ধীকে দিয়ে তৎকালীন ভারত সরকারের নীতি ও মনোভাবকে তুলে ধরা হয়েছে। ভারতের প্রশ্নে কখনও কখনও শরণ শিং, জয়প্রকাশ নারায়ণের ক্যারিকেচার এসেছে। পাকিস্তানকে ফুটিয়ে তুলতে ভুট্টো ও ইয়াহিয়া খানের ক্যারিকেচার ব্যবহার করা হয়েছে। অধিকাংশ সময় ইয়াহিয়া খানকে ভয়ঙ্কর প্রাণীর সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং ভুট্টোকে মূলত ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। মার্কিন সরকারকে ফুটিয়ে তুলতে নিক্সন বা কিসিঞ্জারের ক্যারিকেচার ব্যবহার করা হয়েছে, চীনা সরকারকে ফুটিয়ে তুলতে কখনও চৌ এন লাই, আবার কখনও মাও সে তুং-এর মুখাবয়বকে ব্যবহার করা হয়েছে। *যুগান্তরে* যে সকল কার্টুন প্রকাশিত হয়েছে সেখানে সবচেয়ে বেশি এসেছে ইয়াহিয়ার ছবি (প্রায় ৫৭ বার); এরপর রয়েছে

নিক্সন/কিসিঞ্জার (১৪ বার), ইন্দিরা গান্ধী (১২ বার), ভুট্টো (৯ বার), চৌ এন লাই-মাও সে তুং (৯ বার), শরণ সিং (৭ বার) শেখ মুজিব (৭ বার) এবং পোদগর্নি (২ বার)। কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্রে যেহেতু কাউকে ব্যঙ্গ বা সমালোচনা করা হয় তাই কার্টুনের মূল ভূমিকায় শত্রুই বেশিরভাগ সময় হাজির থাকেন। এখানেও দেখা যাচ্ছে সেই সময়ের নেতিবাচক চরিত্র, বা বলা যায়, যারা *যুগান্তর* এর দৃষ্টিতে যারা প্রতিপক্ষ তাদের ক্যারিকেচার বেশি আঁকা হয়েছে। তৎকালীন প্রেক্ষাপটে ইয়াহিয়া খান, ভুট্টো, কিসিঞ্জার, নিক্সন, চৌ এন লাই-মাও সে তুং, তাঁরা সকলের অবস্থান ছিল প্রতিপক্ষ শিবিরে। এমনকি যখন শেখ মুজিব বা ইন্দিরা গান্ধীকে আঁকা হয়েছে তখনও শত্রু-মিত্র সমীকরণ ছিল। আবার ভারত সরকারের সমালোচনার ক্ষেত্রেও ইন্দিরা গান্ধীকে ব্যবহার করা হয়েছে। রাজনৈতিক কার্টুন যে প্রধানত রাজনৈতিক সমালোচনারই একটা মাধ্যম সেটা পরিসংখ্যানই বুঝিয়ে দিচ্ছে।

যুগান্তরে প্রকাশিত কার্টুনগুলোর বিষয়বস্তুকে ভাগ করলে মোটা দাগে কয়েকটি ভাগ পাওয়া যায়: জেনোসাইড, প্রতিরোধ যুদ্ধ, পাকিস্তানি শাসকদের ষড়যন্ত্র, শরণার্থীদের দুঃখ-দুর্দশা, মার্কিন-চীন ও রুশ নীতি, বিশ্ব বিবেকের নীরবতা ও ভারতের সক্রিয়তা, ভারতীয় নীতির সমালোচনা এবং শেষ মুহূর্তের যুদ্ধ ও বিজয়। মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় ধরে ধরে অগ্রসর হলে স্পষ্টত দেখা যাবে যে, ঘটনাবলীর সাথে সাথে কার্টুনের বিষয়বস্তু পরিবর্তিত হয়েছে। মার্চ-এপ্রিল মাসে অসহযোগ আন্দোলন, বাংলায় গণজোয়ার, ইয়াহিয়ার নির্মমতা, গণহত্যা, ভুট্টোর ষড়যন্ত্র, বিশ্ববিবেকের নীরবতাকেই বিষয়বস্তুর কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। মে মাসের দিকে কার্টুনিস্টরা ভারতীয় নীতির সমালোচনা করা শুরু করেন, বিশেষত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার পক্ষে এক ধরনের সম্মতি উৎপাদনের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। জুন-জুলাইতে আন্তর্জাতিক রাজনীতি, বিশেষত মার্কিন ও চীনা নীতির সমালোচনা করেও কার্টুন প্রকাশিত হয়েছে। আগস্ট-ডিসেম্বর মাসে শরণার্থী সমস্যা, বিজয়, শেষ মুহূর্তের যুদ্ধ এবং ইয়াহিয়ার আসন্ন পরাজয়ের দিকে বারবার ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। ডিসেম্বরে বিজয়কে কেন্দ্র করেও অনেকগুলো কার্টুন প্রকাশিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন পূজা-পার্বনকে মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত করে বিভিন্ন কার্টুন আঁকা হয়।

বিষয়ভিত্তিক আলোচনা

অসহযোগ আন্দোলন ও প্রাথমিক প্রতিরোধ

১৯৭১ সালে মার্চ মাসে গণপরিষদ অধিবেশন স্থগিতাদেশের প্রেক্ষাপটে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। মিছিল, মিটিং, সভা, সমাবেশে রাজপথ তখন উত্তাল। কার্যত তখন বাংলাদেশ শেখ মুজিবের আদেশেই পরিচালিত হচ্ছিল। আবার পুলিশ বাহিনীর আক্রমণে রাস্তায় প্রাণ হারাচ্ছিলেন আন্দোলনকারীরা। যেমন, ৩ মার্চ প্রায় শতাধিক ব্যক্তি হতাহত হন। ৩ ও ৪ মার্চ দুই দিনে কেবল চট্টগ্রামে ১২০ জন শহিদ হন। এছাড়াও আরও বিভিন্ন স্থানে হতাহতের ঘটনা ঘটতে থাকে।[৩৫] *যুগান্তরে* প্রকাশিত কার্টুনে সে আন্দোলনকে যেমন ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে [ছবি-১], তেমনি সামরিক বাহিনীর আক্রমণে বিভিন্ন স্থানে আন্দোলনকারীদের প্রাণ হারানোকেও ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল [ছবি-২]। ছবি ১-এ দেখা যাচ্ছে, পূর্ববঙ্গে বৈঠক করতে এসে জনগণের মুষ্ঠিবদ্ধ হাতের মুঠোয় ইয়াহিয়া খান। ছবি ২-এ পূর্ববাংলার মানুষের মাথার খুলির উপর দাঁড়ানো শকুনরূপী ভূট্টোকে দেখা যাচ্ছে। তিনি বলছেন, পূর্ববাংলার পরিস্থিতির জন্য তারা দায়ী নন।

২৫ মার্চে জেনোসাইড শুরু হওয়ার পর দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাথমিক প্রতিরোধ যুদ্ধের সূচনা ঘটে। মার্চ-এপ্রিল মাসে প্রকাশিত সংবাদের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল সাধারণ জনগণ কর্তৃক প্রাথমিক পর্যায়ের প্রতিরোধ। পূর্বেই বলা হয়েছে সংবাদ পরিবেশনে অতিরঞ্জন করা হতো। প্রাথমিক যুদ্ধ বিষয়ক কার্টুনগুলো এপ্রিল মাসেই প্রকাশিত হয়েছে বেশি। উদাহরণস্বরূপ ছবি-৩ দেখা যেতে পারে। এই কার্টুনে ইয়াহিয়া খানকে কুমির রূপে চিত্রায়ণ করা হয়েছে। মুক্তিফৌজ ডাণ্ডা হাতে ইয়াহিয়ার মাথায় বাড়ি দিতে যাচ্ছে। এখানে সাধারণ জনগণের প্রতিরোধ যুদ্ধের, বিশেষত প্রাথমিক পর্যায়ের সফলতার দিকে আলোকপাত করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, *যুগান্তর* প্রাথমিক যুদ্ধ শুরু হওয়া মাত্রই তাদের পত্রিকায় মুক্তিযোদ্ধাদেরকে 'মুক্তিফৌজ' নামেই চিহ্নিত করে। এই অংশের কার্টুনে মূল চরিত্র হিসেবে পূর্ব বাংলাকে চিত্রিত করা হয়েছে।

ছবি ১: ১৭ মার্চ ১৯৭১, সুফি ছবি ২: ৭ মার্চ ১৯৭১, সুফি ছবি ৩: ৯ এপ্রিল ১৯৭১, অমল

জেনোসাইডের নির্মমতা

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনী যে জেনোসাইড সংঘটিত করে তাতে প্রায় ৩০ লক্ষ লোক প্রাণ হারান। *যুগান্তর-এর* কার্টুনগুলোর একটা বড়ো অংশ জুড়েই [প্রায় এক তৃতীয়াংশ] পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মমতাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কার্টুনগুলোতে সরাসরি জেনোসাইড দেখানো না হলেও, ইয়াহিয়াকে বিভিন্ন পশু রূপে চিত্রিত করে তাঁর নির্মমতাকে ফুটিয়ে তোলা হতো। উদাহরণস্বরূপ ৪ নং ছবি দেখা যেতে পারে। মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে *যুগান্তর* আশংকা প্রকাশ করে ২৫ মার্চ থেকে ইতোমধ্যে ১০ লক্ষ বাঙালি গণহত্যায় প্রাণ হারিয়েছেন। একই সময়ে বিদেশি সাংবাদিকরা পূর্ব বাংলা সফর করেন। তা নিয়ে *যুগান্তর* লেখে, বিদেশি সাংবাদিকরা পূর্ববঙ্গে শকুনিদের মহোৎসব দেখে এলেন। উপরোক্ত কার্টুনে শকুনরূপী ইয়াহিয়াকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যিনি বলছেন, 'অস্ত্রশস্ত্র চাই না- কিছু হজমী দিয়ে সাহায্য করুন।' গণহত্যা-নির্যাতন ও নির্মমতার বিষয়টা এপ্রিল, মে, জুন ও জুলাই মাসে প্রকাশিত কার্টুনে বেশি প্রকাশিত হয়েছে। জেনোসাইডের নির্মমতা ফুটিয়ে তোলার পাশাপাশি এর সহযোগী হিসেবে [নিক্সনরূপী] যুক্তরাষ্ট্র ও [মাও-রূপী] চীনের কথা বারবার এসেছে। ইয়াহিয়া খান ভুট্টোর সাথে মিলে পূর্ব বাংলায় হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছেন, সেই যজ্ঞে বিভিন্নভাবে মদত দিচ্ছেন নিক্সন ও মাও/ চৌ। আবার সেই হত্যাযজ্ঞে নীরব বিশ্ববিবেক, প্রতিবাদ প্রতিরোধে এগিয়ে আসছে না। ঘুমন্ত বিশ্ববিবেককে জাগ্রত করার কাজ করে যাচ্ছে ভারত। সামগ্রিকভাবে জেনোসাইড সংক্রান্ত কার্টুনে এই সুরটাই প্রাধান্য পেয়েছে।

ছবি ৪: ১৪ মে ১৯৭১, অমল

ষড়যন্ত্র ও রাজনীতি

মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানিদের বিভিন্ন ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রায় প্রতিমাসেই ধারাবাহিকভাবে কার্টুন প্রকাশিত হয়েছে। মার্চ মাসে প্রকাশিত বিভিন্ন কার্টুনে ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর ষড়যন্ত্রকে আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন ছবি-৫। একাত্তরের ২০ মার্চের বৈঠক শেষে শেখ মুজিব জানান, বৈঠকে অগ্রগতি হয়েছে। আবার ঐদিনই জানা যায়, প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে পিপিপি নেতা ভুট্টো বৈঠকে যোগ দিতে ঢাকা আসছেন। ২১ মার্চ বিকালে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের মিলিত হওয়ার জন্য ভুট্টো এসে ঢাকা পৌঁছান।[৩৬] এই বৈঠকে যে ইয়াহিয়ার পিছনে থেকে ষড়যন্ত্রে মূল ইন্ধন ভুট্টো দিয়ে যাচ্ছেন সেটাই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কার্টুনে। 'বিশালকায়' শেখ মুজিবের সামনে বন্দুকহাতে দ্বিধান্বিত ইয়াহিয়ার পিঠে বন্দুক ঠেকিয়ে ভুট্টো হুশিয়ারি দিচ্ছেন, 'আশা করি বেফাঁস কিছু বলবেন না।' ভুট্টো চাইতেন মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক যেন কোনো ধরনের মীমাংসায় পৌঁছাতে না পারে। জানা যায়, ভুট্টো ঢাকা এসে ইয়াহিয়া খানের আপোষ ফর্মুলা দেখে বেঁকে বসেন।[৩৭] ইয়াহিয়া ভুট্টোর সাথে মার্কিন ও চীনের ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত বিভিন্ন কার্টুনে দেখা যায়।

ছবি ৫: ২৩ মার্চ ১৯৭১, অমল

শরণার্থী সঙ্কট

অপারেশন সার্চলাইটের মাধ্যমে জেনোসাইড শুরু হওয়ার পর প্রায় এক কোটি শরণার্থী ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় নেন। শরণার্থীদের দুঃখ চিত্রিত করার পাশাপাশি শরণার্থীদের কারণে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যে ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি হয়েছে সেটা ছিল এই বিষয়ক কার্টুনের মুখ্য বিবেচ্য বিষয়। শরণার্থীদের চাপ ভারতের মুক্তিযুদ্ধ প্রশ্নে, বিশেষত বিশ্বব্যাপী অনুকূল একটি জনমত গড়ে তুলতে, খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে যুদ্ধের শেষ পর্যায়ের সামরিক হস্তক্ষেপের 'হিউম্যানিটেরিয়ান' দিকের জন্য শরণার্থীজনিত চাপের কথা বারবার বর্ণিত হয়েছে।[৩৮] শরণার্থীদের কারণে ভারতে যে স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা দেখা দেয় সেগুলোও বিভিন্ন কার্টুনে প্রাধান্য পেয়েছিল। যেমন, ৬ নং ছবির শিরোনাম 'জয় বাঙলা'। শরণার্থীদের আগমনে কলকাতায় একের পর এক রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে থাকে। জানা যায় একাত্তরে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চাশ লক্ষ লোক 'চোখ উঠা' রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। মে মাস থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের অনেকাংশে এই সংক্রামক রোগটি ছড়িয়ে পড়ে। একই সাথে শরণার্থী শিবিরে কলেরা রোগ ভয়াবহ আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই রোগকে তখন *জয়বাংলা* রোগ বলা হতো।[৩৯] সে সময়ের টানাপোড়ন এই কার্টুনে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। শরণার্থী সমস্যা যে ভারতের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিমণ্ডলে মারাত্মক সমস্যা হিসেবে হাজির হয়েছে সেটাও ফুটিয়ে তোলা হতো [ছবি-৭]। আবার, যেহেতু ভারতের তৎকালীন কূটনীতিতে শরণার্থী সঙ্কট ছিল সবচেয়ে কার্যকর উপাদান, সেহেতু শরণার্থী সংকটকে উপজীব্য করে কার্টুনে ভারতীয় কূটনীতিকদের সক্রিয়তা ও বাকি বিশ্বের নিষ্ক্রিয়তা বোঝানো হতো। যেমন, ৮ নং ছবিতে দেখা যাচ্ছে, শরণার্থী সমস্যাকে কেন্দ্র করে শরণ সিং বিশ্ব নেতাদের পিছনে পিছনে দৌড়াচ্ছেন, নেতারা শরণ সিংকে এড়িয়ে যাচ্ছেন। শরণার্থীদের দেশে ফিরে আসার ইয়াহিয়ার আশ্বাসকে বিদ্রূপ করেও বেশ কিছু কার্টুন আঁকা হয়েছিল। এপ্রিল-অক্টোবর পর্যন্ত বিভিন্ন কার্টুনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শরণার্থী সঙ্কট উপস্থাপিত হতো।

ছবি ৬: ৫ জুন ১৯৭১, অমল ছবি ৭: ৫ জুন ১৯৭১, সুফি ছবি ৮: ১৯ জুন ১৯৭১, অমল

মার্কিন চীন ও রাশিয়ার নীতি

মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নে খুব মোটা দাগে আন্তর্জাতিক পরাশক্তি দুই শিবিরে বিভক্ত ছিল: যুক্তরাষ্ট্র ও চীন পাকিস্তানের পক্ষ নেয়, রাশিয়া ভারতের পক্ষে। ইতিহাসের এই সময়ে পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কে উন্নতি ঘটে, অন্যদিকে ভারত ও সোভিয়েত রাশিয়া সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদন করে।[৪০] ফলে, *যুগান্তর-এর* কার্টুনে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন বারবার এসেছে শত্রু হিসেবে। রাশিয়ার উপস্থিতি অনেক কম, তবে সেটা বন্ধু হিসেবেই। পূর্ব বাংলায় যে ভয়াবহ তাণ্ডব চলছে তার সহযোগী হিসেবে বারবার চিত্রিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন। কখনও কখনও ইয়াহিয়া তথা

পাকিস্তান গৌণ হয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন মুখ্য হয়ে ওঠে। দেখা যায় যে, আসল যুদ্ধটা যুক্তরাষ্ট্র ও চীনই করছে, ইয়াহিয়া তথা পাকিস্তান কেবল তাদের হাতের পুতুল। আবার কার্টুনে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি ছিল দ্বিমুখী। একদিকে শরণার্থী শিবিরে সাহায্য প্রদান করছিল, অন্যদিকে পাকিস্তানকে অস্ত্র দিচ্ছিল। [ছবি-৯] আবার, চীনের মদদে ইয়াহিয়া ও ভুট্টো কাজ করছেন এমন কার্টুন আঁকা হয়। ১০ নং ছবিতে দেখা যাচ্ছে, পাকিস্তান সরকারকে কে, কত অস্ত্র সরবরাহ করতে পারে তা নিয়ে আমেরিকা ও চীনের মাঝে প্রতিযোগিতা চলছে। ইয়াহিয়া 'বিপদ' চিহ্নিত পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত আমেরিকা ও চীনকে নিয়ে অঙ্কিত কার্টুনগুলো দেখতে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা দরকার যে, চীন তখন ভারত ও বাংলাদেশের বামপন্থী আন্দোলনের কুশীলবদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ নাম। ভারত তখন উত্তাল ছিল নকশাল আন্দোলনে। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় তখন চীনপন্থী কমিউনিস্টদের কাছে মাও সে তুং সবচেয়ে বড়ো আদর্শিক নেতা। চীনপন্থীদের তখন জনপ্রিয় শ্লোগান ছিল, 'চীনের চেয়ারম্যান, আমাদের চেয়ারম্যান'। ১১ নং ছবিতে দেখা যাচ্ছে, এই স্লোগান ইয়াহিয়া খান দেয়ালে লিখছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় নকশাল ও বিভিন্ন বামপন্থীদের নিয়ে ভারতের ক্রমাগত ভীতি গোপন কোনো বিষয় ছিল না। আবার চীনের অবস্থান বাংলাদেশের চীনপন্থীদের জন্য অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি করে, কোনো কোনো পার্টি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রশ্নে দ্বিধান্বিতও ছিল। কার্টুনে এই স্লোগান ব্যবহার যে তৎকালীন ভারতের নকশাল বা মাওবাদীদের রাজনীতি নিয়ে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি ফুটিয়ে তুলছে তা স্পষ্ট।

ছবি ৯: ২৬ জুন ১৯৭১, সুফি

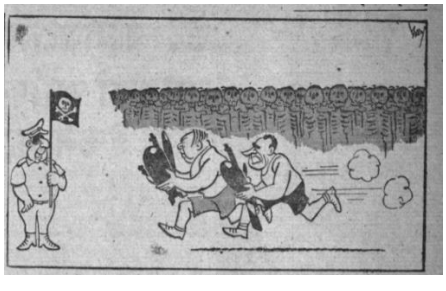

ছবি ১০: ৩ জুলাই ১৯৭১, অমল

ছবি ১১: ২১ এপ্রিল ১৯৭১, অমল

ভারতের সমালোচনা

মে মাসে ভারতের নীতিকে সমালোচনা করে বেশ কয়েকটি কার্টুন আঁকা হয়েছিল। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে দেরি করা এবং পাকিস্তানের আক্রমণাত্মক আচরণের বিপরীতে সরাসরি যুদ্ধে না জড়িয়ে কেবল বিবৃতি প্রদান করা- এই দুটো বিষয়ের সমালোচনা করে কার্টুনগুলো আঁকা হয়েছিল। তাতে দেখা যায়, পাকিস্তানের বিভিন্ন আক্রমণে ভারত সরকার নিশ্চুপ থাকছে, কেবল বিবৃতি দিচ্ছে। আবার বাংলাদেশেকে স্বীকৃতি প্রদানের প্রসঙ্গ উঠলে ভারত গড়িমসি করছে। উল্লেখ্য, একাত্তরের এপ্রিল-মে মাসের দিকে ভারতের বিভিন্ন মহল থেকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার দাবি উঠলেও, কারও কারও মতে, কৌশলগত কারণে ইন্দিরা গান্ধী সেটা এড়িয়ে যান।[৪১] সমালোচনামূলক ধারার একটি কার্টুন প্রকাশিত হয় ১১ মে। সে কার্টুনের শিরোনামে একটি সংবাদ পরিবেশন করা হয়: 'বাংলাদেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেবার ব্যাপারে বিরোধী দলগুলির নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির কাছ থেকে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি আদায় করার চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু তাদের সে চেষ্টা সফল হয়নি। শ্রীমতী গান্ধী শুধু বলেন, এই স্বীকৃতিদানের বিষয়টির সব দিক নিয়ে বিচার-বিবেচনা করতে হবে এবং এর তাৎপর্য অনুধাবন করতে হবে। তবে তিনি এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন, 'যথোচিত আন্তরিকতার সঙ্গে ভারত সরকার প্রশ্নটি বিবেচনা করা দেখছে।' বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার ব্যাপারে ভারত সরকারের এই গড়িমসিকে *যুগান্তর* সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করে। কার্টুনে দেখা যায় উপর্যুক্ত সংবাদ শোনার পর ইয়াহিয়া খান ও ভুট্টো আনন্দে 'ভারত সরকার জিন্দাবাদ!', 'নয়াদিল্লী জিন্দাবাদ!' সম্বলিত প্ল্যাকার্ড হাতে শ্লোগান দিচ্ছেন। তাদের পাশে পড়ে রয়েছে মৃত মানুষের কঙ্কাল [ছবি- ১২]। একই বিষয় ফুটে উঠেছে ১৩ নং ছবিতে। উল্লেখ্য ভারতের সমালোচনামূলক কার্টুনগুলো এঁকেছিলেন অমল।

ছবি- ১২: ১১ মে ১৯৭১, অমল

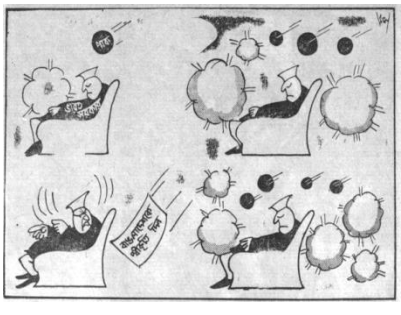

ছবি- ১৩: ১২ মে ১৯৭১, অমল

নিষ্ক্রিয়তা বনাম সক্রিয়তা

অনেকগুলো কার্টুনে বিশ্বকে নিষ্ক্রিয় ও নীরব অবস্থার বিপরীতে ভারতকে সক্রিয় অবস্থায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বিশেষত সবচেয়ে বেশি সমালোচনা করা হয়েছিল জাতিসংঘের নীরবতাকে। এই বিষয়ক কার্টুনগুলো সাধারণত এপ্রিল-মে-জুন মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। একই সময়ে ভারতের কূটনীতিকরা বিশ্বজনমত গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন দেশের সফর করছিলেন।[৪২] যেমন, ইন্দিরা গান্ধীর বিশেষ দূত হিসেবে ভারতের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য বিদেশ সফর শুরু করেন। কেউই তেমন সাড়া দেননি [ছবি-১৪]। ১৩ জুনে প্রকাশিত কার্টুনে [ছবি- ১৫] বিশ্ববিবেকের নিশ্চল নীরবতা ভাঙতে শরণ সিং এর তৎপরতাকেই এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

ভারতের নিজেকে সক্রিয় করার পাশাপাশি প্রধান চরিত্র হিসাবে হাজির করার প্রবণতা রয়েছে। যেমন, ছবি-১৬। এখানে পাকিস্তানকে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের পালিত কুকুর হিসেবে চিত্রায়ণ করা হয়েছে। পাকিস্তান যে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মদতে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে এমন বিষয়ের উপস্থিতি প্রসঙ্গে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কুকুরের দড়ি ছেড়ে দিয়ে সাহেবরা খোশ আলাপে মত্ত ও ব্যস্ত। বাংলাদেশ হচ্ছে এখানে শিশু। ভারত একাই পাকিস্তান নামক কুকুর থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এখানে বাংলাদেশ নেহায়েৎ একজন বাচ্চা। তার যেন কোনো নিজস্ব অবস্থান নেই; বাংলাদেশ নামক শিশুকে রক্ষা করার দায়িত্ব একাই ভারতের। অর্থাৎ 'হিউমেনিটেরিয়িয়ান ইন্টারভেনশন'কেন্দ্রিক বয়ানের পাশাপাশি নিজেকে প্রধান কর্তা হিসেবে হাজির করার সুরটাও এতে স্পষ্ট। মুক্তিযুদ্ধ প্রশ্নে ভারতের এই বয়ানই বর্তমান ভারতীয়

রাজনৈতিক মহলে প্রভাবশালী বয়ান হয়ে উঠছে। ফলে, ভারতীয় সাম্প্রতিক উদ্‌যাপনে একাত্তরের ঘটনাবলিকে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হিসেবে চিত্রিত করা হয়ে থাকে।[৪৩]

ছবি ১৪: ৬ জুন ১৯৭১, রেবতী ভূষণ

ছবি ১৫: ১৩ জুন ১৯৭১, রেবতী ভূষণ

ছবি- ১৬: ২৯ মে ১৯৭১, রেবতী ভূষণ

শেষ যুদ্ধ ও বিজয়

নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসের দিকে এসে কার্টুনের বিষয়বস্তুতে পরিবর্তন আসে। তখন পাকিস্তানি বাহিনীর আসন্ন পরাজয় এবং যৌথ বাহিনীর সম্ভাব্য বিজয় ছিল কার্টুনের প্রধান বিষয়বস্তু। তৎকালে ইয়াহিয়া খান বা পাকিস্তানি বাহিনীর রণহুঙ্কারকে বিদ্রূপাত্মকভাবে ফুটিয়ে তোলা হতো। পাশাপাশি পাকিস্তানি বাহিনীর সামর্থ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলা হতো। ১৬ ডিসেম্বরে আত্মসমর্পণের পর ইয়াহিয়া যে শিক্ষা পেয়েছেন সেটাও ছিল কার্টুনের বিবেচ্য। বিভিন্ন পূজা-পার্বন ও পহেলা বৈশাখের মতো বিশেষ দিবসকে কেন্দ্র করে কার্টুন আঁকা হতো। সেই কার্টুনগুলোতে সাধারণত স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান সঙ্কট কাটিয়ে ওঠা ও ভবিষ্যত বাংলাদেশের প্রতি শুভকামনাও থাকত।

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে *যুগান্তরে* প্রকাশিত কার্টুনের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য সহজেই অনুমেয়। মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নে বাংলাদেশকে সমর্থন দেয়ার ক্ষেত্রে *যুগান্তর* কোনো ন্যূনতম রাখঢাক রাখেনি।

ফলে *যুগান্তরে* খোদ ভারতীয় নীতির সমালোচনা করেও কিছু কার্টুন প্রকাশিত হয়েছে, যেগুলো অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত কার্টুনে চোখে পড়েনি। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে, অর্থাৎ অসহযোগ আন্দোলন থেকেই বাংলাদেশের প্রশ্নে *যুগান্তর-এর* উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো।

কার্টুনে পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মমতা ইয়াহিয়ার দানবীয় ও পশুর চেহারার মাধ্যমে বারবার ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আবার শুরুর দিকে প্রতিরোধ যুদ্ধে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ যেভাবে চিত্রিত হয়েছিল, শেষের দিকে এটি খানিকটা কমে গিয়েছিল। বরং ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের একটা আবহও তাতে ফুটে উঠেছিল। কার্টুনের বিষয়বস্তুতে শরণার্থী সঙ্কট খুবই গুরুত্ব পেয়েছিল। শরণার্থীদের দুঃখ-দর্দশা যেমন ফুটে উঠেছে, একইভাবে ফুটে উঠেছে শরণার্থীদের আগমণের ফলে ভারতে যে প্রভাব পড়েছিল তার স্বরূপ। মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে আন্তর্জাতিক রাজনীতি এই কার্টুনগুলোর একটি বড়ো অংশ জুড়ে ছিল। একাত্তরে দক্ষিণ এশিয়া যে আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটা ময়দান হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল সেটা মোটামুটি কার্টুনগুলো পরিষ্কারভাবেই তুলতে সক্ষম হয়েছিল। তবে, অধিকাংশ কার্টুনে মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক ভারতীয় আধিপত্যশীল বয়ানকেই পাওয়া যায়। সেই বয়ানটা ভারতের 'হিউম্যানিটেরিয়ান ইন্টারভেনশন' থেকে শুরু করে ভারতকে মূল কর্তা হিসেবে হাজির করা পর্যন্ত বিস্তৃত।

কার্টুনগুলো সাধারণত কোনো না কোনো সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতেই আঁকা হতো। ফলত এই কার্টুনগুলোর ধারাবাহিক পাঠ সে সময়কে দুর্দান্তভাবে উপস্থাপন করে। কিছু কিছু কার্টুনে বিদ্রূপের চেয়ে ঘটনার আবেগময়তা হয়ে উঠেছিল প্রধান অঙ্গ। কার্টুনে যতগুলো চরিত্র এসেছে সর্বাধিক এসেছে শত্রুর চেহারা। পাশাপাশি, এখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তির ক্যারিকেচারগুলো ব্যক্তিত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং ব্যক্তির চেহারা দিয়ে আসলে তার দেশ, রাজনীতি ও নীতিকে উপস্থাপন করা হতো। ফলে শেখ মুজিব আসলে ব্যক্তি শেখ মুজিব থাকেননি, তিনি আন্দোলনরত বাঙালিদের প্রতীক হয়ে ওঠেন। ইন্দিরা গান্ধী, ইয়াহিয়া খান, নিক্সন, কেউই আসলে ব্যক্তি থাকেন না। তারা বিশেষ বিশেষ সময়ে তাদের রাষ্ট্রীয় নীতির প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. রাশেদ রাহম, 'কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র ও দমনমূলক আইন: পাকিস্তানের অভিজ্ঞতা (১৯৪৭-১৯৫৮)', *তত্ত্বতালাশ*, দ্বিতীয় সংখ্যা, অক্টোবর ২০২১, পৃ. ১১০-১৫২

২. বি বি: মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধের ১৩ নং সেক্টর*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১২; মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধে সাংস্কৃতিক অবদান*, প্রথমা, ঢাকা, ২০২০

৩. বি বি: রিয়াজ আহমেদ, *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ (কার্টুন)*, অনন্যা, ঢাকা ২০০৮; জয়দীপ দে, *একাত্তরের কার্টুন*, জলধি, ঢাকা, ২০২০

৪. Dirk Kotzé, 'Cartoons as a medium of political communication', *Communicatio* Vol 14 : 2, South African Journal for Communication Theory and Research, 1988, P. 60-70 [DOI:10.1080/02500168808537742]

৫. *Ibid*

৬. Jenn Burleson Mackay, 'What Does Society Owe Political Cartoonists?', *Journalism Studies* Vol 18:1, 2017, P. 28-44 [DOI: 10.1080/1461670X.2016.1218297]

৭. Natalia M Dugalich, 'Political cartoon as a genre of political discourse', *RUDN Journal of Language Studies, Semiotics and Semantics* Vol 9 :1, 2018, P. 158-172 [doi: 10.22363/2313-2299-2018-9-1-158-172]

৮. *Ibid*

৯. Matthew Diamond, 'No Laughing Matter: Post-September 11 Political Cartoons in Arab/Muslim Newspaper', *Political Communication* Vol. 19 : 2, 2002, P. 251-272 [DOI: 10.1080/10584600252907470]

১০. W. A. Coupe, 'Observations on a Theory of Political Caricature', *Comparative Studies in Society and History* Vol 11 : 1, Jan 1969, P. 79-95

১১. 'RAB arrests cartoonist Kishore, writer Mushtaq Ahmed in digital security case', *bdnews24.com*, 06 May 2020

১২. Chris Lamb, 'Drawing Power: The limits of editorial cartoons in America', *Journalism Studies* Vol 8 : 5, 2007, P. 715-729

১৩. Erik Bleich, 'Free Speech or Hate Speech? The Danish Cartoon Controversy in the European Legal Context', In: Khory K.R. (eds) *Global Migration*, Palgrave Macmillan, New York. 2012, P. 113-128; Simon Cottee, 'Flemming Rose: The Reluctant Fundamentalist', *The Atlantic*, 15 March 2016 ; Malcolm Brabant, 'Free speech at issue 10 years after Muhammad cartoons controversy', *DW*, 30 Sep 2015

১৪. Jenn Burleson Mackay, 'What Does Society Owe Political Cartoonists?', *Journalism Studies* Vol 18:1, 2017, P. 28-44 [DOI: 10.1080/1461670X.2016.1218297]

১৫. মাহমুদুল হোসেন, 'ব্যঙ্গচিত্র', *চারু ও কারু কলা*, লালা রুখ সেলিম সম্পা., (ঢাকা:বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), পৃ. ২২৫-২৩৫

১৬. দেবযানী বিশ্বাস, 'বসন্তক: বাংলা ভাষার পথিকৃৎ কার্টুন পত্রিকা', *ইতিহাস অনুসন্ধান* (৩০),পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২৪ জানুয়ারি ২০১৬, পৃ.৭৮৭-৭৯৫

১৭. *তদেব*

১৮. Mahboob Alam, 'Bengal Cartoons Before the End of the Raj?', *Jamini*, Sep 2009, P. 96-104

১৯. Lawrence H Streicher, 'On a Theory of Political Caricature', *Comparative Studies in Society and History* Vol. 9 : 4, 1967, P. 427–445. [DOI: https://doi.org/10.1017/S001041750000462X]

২০. W. A. Coupe, 'Observations on a Theory of Political Caricature', *Comparative Studies in Society and History* Vol 11 : 1, Jan 1969, P. 79-95

২১. Matthew Diamond, 'No Laughing Matter: Post-September 11 Political Cartoons in Arab/Muslim Newspaper', *Political Communication* Vol. 19 : 2, 2002, P. 251-272 [DOI: 10.1080/10584600252907470]

২২. মোহাম্মদ বশির আহাম্মদ, '১৯৫৪ সালে পূর্ববাংলার সাধারণ নির্বাচন ও কলকাতার দৈনিক যুগান্তর', *ইতিহাস অনুসন্ধান* (২৫), পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২৪ জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৯৭১

২৩. আবদুল গাফফার চৌধুরী, 'একটি যুগসন্ধির পত্রিকা যুগান্তর', *যুগান্তর*, ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮,

২৪. *যুগান্তর*, ৩০ মার্চ ১৯৭১

২৫. *তদেব*

২৬. অপারেশন সার্চলাইট সম্পর্কে *বাংলাপিডিয়া* (অনলাইন) থেকে নির্বাচিত অংশ তুলে ধরা হলো: "অপারেশন সার্চলাইট পাকিস্তানে স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী মুক্তিকামী বাঙালিদের কঠোর হস্তে দমনের জন্য ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তান সামরিক বাহিনী যে সশস্ত্র অভিযান পরিচালনা করে সামরিক কর্তৃপক্ষ একে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে অভিহিত করে। এ অপারেশনের উদ্দেশ্য ছিল ঢাকাসহ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান শহরগুলিতে বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা ও ছাত্র নেতৃবৃন্দ এবং বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের গ্রেপ্তার ও প্রয়োজনে হত্যা, সামরিক আধা সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর বাঙালি সদস্যদের নিরস্ত্রীকরণ, অস্ত্রাগার, রেডিও ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দখলসহ প্রদেশের সামগ্রিক কর্তৃত্ব গ্রহণ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন কঠোর হস্তে দমন করে প্রদেশে পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। অপারেশন সার্চলাইটের আওতায় ২৫ মার্চ রাত সাড়ে এগারটা থেকে মধ্য মে পর্যন্ত বড় বড় শহরে অভিযান পরিচালিত হয়।

অপারেশন সার্চলাইট অভিযান শুরুর সময় নির্ধারিত ছিল ২৬ মার্চ রাত ১টা। কিন্তু ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে তাঁর বৈঠকে কোনো ইতিবাচক ফলাফল না পেয়ে সবাইকে সর্বাত্মক সংগ্রামের জন্য তৈরি হওয়ার আহ্বান জানান। সে রাতেই ঢাকার বিভিন্ন স্থানে মুক্তিকামী বাঙালি প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান ও এ.এ.কে নিয়াজীর জনসংযোগ কর্মকর্তা মেজর সিদ্দিক সালেক মন্তব্য করেছেন যে, বাঙালি বিদ্রোহীদের প্রবল প্রতিরোধ সৃষ্টির আগেই পাকিস্তান বাহিনী ঢাকার বিভিন্ন স্থানে পৌঁছার লক্ষ্যে অভিযান এগিয়ে ২৫ মার্চ রাত ১১-৩০ মিনিটে শুরু হয়। অবশ্য ৫ আগস্ট প্রকাশিত পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্রে উল্লেখ করা হয় যে, আওয়ামী লীগ ২৬ মার্চ ভোরে একটি সশস্ত্র বিদ্রোহ করার পরিকল্পনা নিয়েছিল। শ্বেতপত্রে উল্লেখিত এ তথ্যকেও অভিযান এগিয়ে আনার সম্ভাব্য কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

পাকিস্তান বাহিনীর ১৪ ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা এবং ৫৭ ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী খান ১৯৭১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি অপারেশন সার্চলাইট নামে একটি সামরিক অভিযানের বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছেন। ১৭ মার্চ চীফ অব স্টাফ জেনারেল আবদুল হামিদ খানের নির্দেশে জেনারেল রাজা পরদিন ঢাকা সেনানিবাসে জিওসি অফিসে অপারেশন সার্চলাইট পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেন। পাঁচ পৃষ্ঠার এই পরিকল্পনাটি রাও ফরমান আলী নিজ হাতে লিখেন। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২৪-২৫ মার্চ জেনারেল হামিদ, জেনারেল এ. ও মিঠঠি, কর্নেল সাদউল্লাহ হেলিকপ্টারে করে বিভিন্ন সেনানিবাসে প্রস্তুতি পরিদর্শন করেন। সিদ্ধান্ত হয়, ২৫ মার্চ রাত ১টায় অপারেশন সার্চলাইটের আওতায় অভিযানে ঢাকায় নেতৃত্ব দিবেন জেনারেল রাও ফরমান আলী। দেশের অন্যান্য অঞ্চলে নেতৃত্ব দিবেন জেনারেল খাদিম রাজা। লে. জেনারেল টিক্কা খান ৩১ ফিল্ড কমান্ডে উপস্থিত থেকে অপারেশনের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবেন। এ ছাড়া এ অভিযানকে সফল করার জন্য ইতোমধ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের দুজন ঘনিষ্ঠ অফিসার মেজর জেনারেল ইখতেখার জানজুয়া ও মেজর জেনারেল এ.ও মিঠঠিকে ঢাকায় আনা হয়।

অপারেশন সার্চলাইটের আওতায় নিম্নোক্ত পরিকল্পনা নেয়া হয়: ১. একযোগে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে অপারেশন শুরু হবে। ২. সর্বাধিক সংখ্যক রাজনীতিক ও ছাত্রনেতা, শিক্ষক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার চরমপন্থীদের গ্রেফতার করতে হবে। ৩. ঢাকার অপারেশনকে শতকরা ১০০ ভাগ সফল করতে হবে। এ জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দখল করতে হবে। ৪. সেনানিবাসের নিরাপত্তা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। ৫. যাবতীয় অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ মাধ্যম বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, রেডিও, টিভি, টেলিপ্রিন্টার সার্ভিস, বৈদেশিক কনস্যুলেটসমূহের ট্রান্সমিটার বন্ধ করে দিতে হবে। ৬. ইপিআর সৈনিকদের নিরস্ত্র করে তদস্থলে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈনিকদের অস্ত্রাগার পাহারায় নিয়োগ করতে হবে এবং তাদের হাতে অস্ত্রগারের কর্তৃত্ব দিতে হবে। ৭. প্রথম পর্যায়ে এ অপারেশনের এলাকা হিসেবে ঢাকা খুলনা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোর, রংপুর, সৈয়দপুর ও সিলেটকে চিহ্নিত করা হবে। চট্টগ্রাম, সিলেট, যশোর, রংপুর ও কুমিল্লায় প্রয়োজনে বিমানযোগে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে।

অপারেশন সার্চলাইটে ঢাকা শহরে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় প্রাধান্য দিয়ে পাকিস্তান সামরিক কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত নেয়: ১. পিলখানায় অবস্থিত ২২নং বালুচ রেজিমেন্ট বিদ্রোহী ৫ হাজার বাঙালি ইপিআর সেনাকে নিরস্ত্র করবে এবং তাদের বেতার কেন্দ্র দখল করবে। ২. আওয়ামী লীগের মুখ্য সশস্ত্র শক্তির উৎস রাজারবাগ পুলিশ লাইনে ৩২নং পাঞ্জাব রেজিমেন্ট এক হাজার বাঙালি পুলিশকে নিরস্ত্র করবে। ৩. ১৮ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট শহরের হিন্দু অধ্যুষিত নবাবপুর ও পুরনো ঢাকা এলাকায় আক্রমণ চালাবে। ৪. ২২নং বালুচ, ১৮ ও ৩২নং পাঞ্জাব রেজিমেন্টের বাছাই করা একদল সৈন্য আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী শক্তিকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল (জহরুল হক হল), জগন্নাথ হল ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের লিয়াকত হল আক্রমণ করবে। ৫. বিশেষ সার্ভিস গ্রুপের এক প্লাটুন কমান্ডো সৈন্য শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ি আক্রমণ ও তাঁকে গ্রেফতার করবে। ৬. ফিল্ড রেজিমেন্ট দ্বিতীয় রাজধানী ও সংশ্লিষ্ট বসতি (মোহাম্মদপুর-মিরপুর) নিয়ন্ত্রণে রাখবে। ৭. শক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশে এম ২৪ ট্যাংকের একটি ছোট্ট স্কোয়াড্রন আগেই রাস্তায় নামবে এবং প্রয়োজনে গোলা বর্ষণ করবে। ৮. উপর্যুক্ত সৈন্যরা রাস্তায় যেকোন প্রতিরোধ ধ্বংস করবে এবং তালিকাভুক্ত রাজনীতিবিদদের বাড়িতে অভিযান চালাবে।"

২৭. Willem Van Schendel, 'A War Within a War: Mizo rebels and the Bangladesh liberation struggle', *Modern Asian Studies* Vol. 1, Oct 2015, P. 1-43 [DOI:10.1017/S0026749X15000104]

২৮. মুনতাসীর মামুন, *পাকিস্তানি জেনারেলদের মন: বাঙালি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ*, সময় প্রকাশনী; রাও ফরমান আলী খান, *বাংলাদেশের জন্ম*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১৭; Khadim Hussain Raja, *A Stranger in My Own Country: East Pakistan, 1969-1971*, UPL, Dhaka, 2012; Lt. Gen. A. A. K. Niazi, *The Betrayal of East Pakistan*,OUP, 1999

২৯. Anam Zakaria, *1971: A People's History from Bangladesh, Pakistan and India*, Vintage, 2019, P. 181

৩০. Willem Van Schendel, 2015

৩১. Anam Zakaria, *1971: A People's History from Bangladesh, Pakistan and India*, Vintage, 2019

৩২. M. D. Hossain, 'Manufacturing Consent: Framng the Liberation War of Bangladesh in the US and UK media', *Journalism* Vol 16 : 4, 2015, P. 521- 535

৩৩. Nayanika Mookherjee, 'Bangladesh War of 1971: A Prescriptin for Reconciliation?', *Economic and Political Weekly*, September 2006. P. 3901-3903

৩৪. সুফি বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত একজন ভারতীয় কার্টুনশিল্পী, তার প্রকৃত নাম নরেন রায়। তার প্রথম কার্টুন প্রকাশিত হয় 'গড়ের মাঠ' নামক খেলার কাগজে। 'স্বাধীনতা' নামক পত্রিকাতে তার প্রথম রাজনৈতিক কার্টুন প্রকাশিত হয়। 'যষ্টিমধু', 'প্রহরা', 'যুগান্তর', 'বসুমতী'তে তিনি নিয়মিত ছবি আকতেন। পশ্চিম বাংলার আরেকজন অগ্রগণ্য কার্টুনিস্ট হচ্ছেন অমল চক্রবর্তী। সুমিত ঘোষের মতে, কার্টুনের আইডিয়া রচনায় তার বুদ্ধিচর্চার অভিজ্ঞান স্পষ্ট। অমল চক্রবর্তী পকেট কার্টুনও আঁকতেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার ওপর আঁকা পকেট কার্টুনে তাঁর স্বচ্ছ ভাবনাচিন্তা পাঠককে সজ্ঞান করেছে। সুমিত ঘোষ মন্তব্য করেন, 'তাঁর রাজনৈতিক কার্টুন সুসংহত, চিত্তগ্রাহী ও মনোজ্ঞ।' কার্টুনিস্ট রেবতীভূষণের পুরো নাম বেরতীভূষণ ঘোষ। তাঁর কার্টুন প্রথম ছাপা হয় আনন্দবাজার পত্রিকায়। সুমিত ঘোষের মতে, প্রতিকৃতি অঙ্কনে তিনি বিশেষ উৎকর্ষতার পরিচয় দেন। তাঁর কার্টুনে পাওয়া যায় কৌতুক ও রগড়। 'কোনওরকম তিক্তশ্লেষ বা ক্রোধ বা ঘৃণা প্রকাশ পায়নি কোনও কার্টুনে।' কার্টুনিস্টদের কাজকর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য: সুমিত ঘোষ, *ভারতে রাজনৈতিক কার্টুন চর্চা*, আনন্দ, কলকাতা, ২০১৩

৩৫. রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, *একাত্তরের দশ মাস*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ২৪-৩৩

৩৬. *তদেব*, পৃ. ৬৭

৩৭. *তদেব*, পৃ. ৬৯

৩৮. ভারতের ভূমিকার বিভিন্ন দিক নিয়ে আইনি আলাপের জন্য দেখা যেতে পারে: *"The Events in East Pakistan, 1971: A Legal Study by The Secretariat of the International Commission of Jurists",* Geveva, 1972, P.87-96

৩৯. বি বি: চৌধুরী শহীদ কাদের, *মুক্তিযুদ্ধে ভারতের চিকিৎসা সহায়তা*, সময়, ২০১৯

৪০. গোলাম মুরশিদ, *মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর: একটি নির্দলীয় ইতিহাস*, প্রথমা, ২০১০, পৃ. ১৩৩

৪১. শামীমা হায়দার, 'একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ভারত: একটি পর্যালোচনা', *ইতিহাস অনুসন্ধান* (২৬), পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২৪ জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ১২৩৫-১২৫২

৪২. *তদেব*

৪৩. '৭১-র মুক্তিযুদ্ধকে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বলছে কেন অনেক ভারতীয়', *বিবিসি বাংলা*, ১৬ ডিসেম্বর ২০২০